রাত-প্রভাতের গান

গ্যাব্রিয়েল পেরী

রাত-প্রভাতের গান
[Toward Singing Tomorrows]
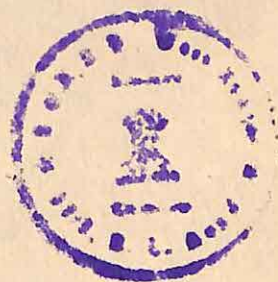
রাত-প্রভাতের গান

রচনা : গ্যাব্রিয়েল পেরী

অনুবাদ : মনীষা সেন

পরিবেশক :

র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব : কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—১৯৫৩

দাম : একটাকা দুই আনা

প্রকাশিকা : রেণু দেবী, দীপায়ন, ১নং রাজা গুরুদাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
মুদ্রাপক : বলদেব রায়, দি নিউ কমলা প্রেস, ৫৭।১ কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

"মৃত্যু দিয়ে রচিল অমর্ত্যনরের রাজধানী"

গ্যাব্রিয়েল পেরীর রাজনৈতিক জবানবন্দী হিসেবে এই পুস্তিকার মূল্য অপরিসীম।

প্যারিস অবরোধকারী নাৎসী জার্মানদের হাতে ১৯৪১ সনের ১৫ই ডিসেম্বর পেরীর জীবন অবসান হয়। বন্দী অবস্থায় হত্যা করা হয় তাঁকে। হত্যার কয়েকদিন আগে লেখা এই আত্মচরিত কয়েদখানা থেকে লুকিয়ে বাইরে আনা হয়, পরে ফরাসী গোপন ছাপাখানা 'এদিসিঅঁ-দ-মিনুই' (Edition de minuit) প্রকাশ করে এই আত্মচরিত।

সহজ স্বচ্ছন্দ ভাবে, অলঙ্কারের বাহুল্য না রেখে, অত্যন্ত পরিমিত ভাষণে পেরী তার জীবন কাহিনী বিবৃত ক'রে গেছেন। অপ্রাসঙ্গিক, অনাবশ্যক একটি কথাও তিনি বলেন নি। প্রতিটি শব্দে, অক্ষরে তীক্ষ্ণবেধ শায়কের ঋজুতা; অগ্নিমন্থ প্রতিটি শব্দ।

এই ঋজুতা, এই অনন্যলক্ষ্যতাই পেরীর জীবনের মূল-মন্ত্র ছিল। বুদ্ধি দিয়ে, যুক্তি দিয়ে, হৃদয় দিয়ে যে পথ তিনি গ্রহণ করেছিলেন, আমৃত্যু সেই পথেই তিনি কঠোর পরিক্রমা ক'রে গেছেন। ফরাসী প্রতিরোধের কবি লুই আরাগঁ-র আক্ষেপোক্তি হয়ত এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। '১৯২০ সনে পেরী যখন আত্মজিজ্ঞাসার অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-

বিক্ষত হ'য়ে সমাধান খুঁজছেন, তখন তাঁর সমসাময়িক বন্ধুরা আলফ্রেড দ্য মুসের মত রোমান্টিক স্রোতে গা ভাসিয়েছেন। কিন্তু উত্তরকালে নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তাদের ক'জন পেরীর পথের পথিক হয়েছিলেন—তাঁর ব্রত গ্রহণ করেছিলেন ?' কেউ-ই না। পেরী সত্যই অনন্যসত্তা। সমস্ত জীবনের সাধনায় ও মৃত্যুবরণে প্রকৃত কম্যুনিষ্টের পরিচয় দিয়ে গেছেন তিনি।

শান্তির বিশ্রামহীন মরণান্তিক অভিযানে অনলস, অক্লান্ত-কর্মী ছিলেন পেরী। একদা তিনি হ্বাইমার রিপাবলিকের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের জাত্যাভিমান সূচক রেভাসেঁর (Revanche) বিরোধিতা ক'রে কারাবরণ করেন, আবার তিনিই হিটলারের অভ্যুদয়ে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাব্যতায় যৌথ নিরাপত্তার একান্ত দিশারী হ'য়ে উঠলেন। মার্সাল ক্যাসঁ্যা সত্যই বলেছিলেন : 'তিনি আলোকের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার জন্য প্রভাতের অপেক্ষা করেননি।' কিন্তু পুরস্কার মিলেছে ঘৃণা, লাঞ্ছনা, হতাদর।

ফ্যাশীষ্ট পত্রিকার সাথে সুর মিলিয়ে 'গ্রিনগোয়ার'-এর পাতায় পাতায় বিদ্রূপ উৎকীর্ণ হ'ত : 'Peri-who-has-not-perished.'। এই ফরাসী বিশ্বাস-হন্তাদের বিরুদ্ধে, দেশদ্রোহীদের বিপক্ষে অনমনীয় দৃঢ়তায় অবিরাম সংগ্রাম ক'রে গেছেন পেরী। ফ্রান্সে তখন জার্মান নাৎসীদের তাণ্ডব-নৃত্য চলেছে, মারণ-যজ্ঞের আয়োজন সুরু হয়েছে গোটা ফ্রান্সের বুকে। এরই

মাঝখানে, শত্রুভয়, মৃত্যুভয় অগ্রাহ্য ক'রে পেরী স্ব-নির্বাচিত কাজ ক'রে গেছেন।

১৯৩৯-৪১ সন ড্রু্য-লা-রচেল[১] জেকিস দোরিও, পিয়ের এটিয়েঁ ফ্লাদিণ[২] ফরাসী মসনদে বসেছে, বিভীষণের উত্তরাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পেরীর মৃত্যু-প্রহর গুণছে 'গ্রিনগোয়ার' ও এই বিভীষণের দল। অথচ ১৯৪১ সনের এপ্রিল মাসে এই 'গ্রিনগোয়ার'-এর পাতায় খবর ছেপে বেরোয় জার্মান বাহিনীর ঠিক নাকের ডগায় ব'সে গ্রাঁদজাতে দ্বীপে মিটিং ক'রে গেছেন পেরী।

অবশেষে ১৯৪১ সনের শরৎকালে জার্মানদের হাতে তিনি বন্দী হন। তাঁকে পথভ্রষ্ট করবার, আদর্শচ্যুত করবার কত প্রচেষ্টা না হয়েছে, কিন্তু হাজার অনুরোধ, উপরোধ, প্রলোভনেও অটল রইলেন তিনি। বিশ্বাস ভঙ্গের একটি শব্দও সৃত হ'ল না বন্ধ ওষ্ঠাধরের সীমানা ছাড়িয়ে। বিভীষণ-বাহিনীর দল ভারী করবার সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হলো।

---

১ ফরাসী সাহিত্যিক ও প্রকাশক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে নাৎসীবাদ প্রচার শুরু করেন। ফ্রান্সের পরাজয় হলে পেতাঁ্যা সরকারের সহযোগিতা করেন।

২ প্রতিক্রিয়াপন্থী বুর্জোয়া রাজনীতিবিদ। ১৯৩৯-পূর্ব্ব ফ্রান্সে তিনি মন্ত্রীত্ব করেন। ১৯৩৮ সনে ম্যুনিক চুক্তির সময় তিনি হিটলারকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ১৯৪০ সনের জুন মাস থেকে তিনি সরাসরি ভাবে পেতাঁ্যা সরকারের পক্ষ অবলম্বন করেন।

লুই আরাগঁ আরেকটি মূল্যবান তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন। 'ল্যমানিতে'র সম্পাদকদ্বয় পেরী ও লুসিয়েঁ সাঁপেই-র মৃত্যুর জন্য এই ফরাসী পঞ্চম বাহিনীই অত্যন্ত তৎপর হ'য়ে ওঠে। রাজনৈতিক কারণে জার্মানরা ঠিক তখনই পেরী ও সাঁপেই-র হত্যার বিপক্ষে ছিল। কিন্তু যৌথ নিরাপত্তা প্রচারক পেরী ও 'কাগুলার' [৩] (cagoulard)-তথ্য-উদঘাটনকারী সাঁপেইকে ফরাসী পঞ্চম-বাহিনী অত্যন্ত বিষ নজরে দেখেছিল। সুতরাং এদের অপসারণে পঞ্চম বাহিনী যে একান্ত তৎপর হ'য়ে উঠবে এ-আর বিচিত্র কি! তখন পেতাঁ্যা সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ পিয়ের পুস্যুর হাতে। কাগুলার দলের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ছিলেন এই মহাত্মা। পেরী ও সাঁপেই-এর কারাদণ্ডের খবর পাওয়া মাত্র তিনি ছুটে আসেন প্যারিসে এবং জেনারেল ফন ষ্টুপাঙ্গেলের সঙ্গে দেখা ক'রে পেরী ও সাঁপেই-এর মৃত্যুদণ্ডের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। জেনারেল সাহেব পুস্যুর এই ইচ্ছা পূরণে অনিচ্ছা প্রকাশ করেননি।

মৃত্যুর পূর্বদিনে পেরীর কাছে ক্যামিল ফেগী মারফৎ আবার আত্মসমর্পণের প্রস্তাব আসে—প্রস্তাব আসে বিশ্বাস-ভঙ্গ করার, কিন্তু মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পেরী সুতীব্র-ঘৃণায় প্রত্যাখান

---

৩ 'হুডপরা দল'—ফরাসী উচ্চমহলের সাথে যোগ সাজসে এরা আন্তর্জাতিক ফ্যাশীবাদের সমর্থক ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে এই দলটিকে খুব সক্রিয় দেখা যায়।

করলেন সে-প্রস্তাব। 'জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী' এই আর্যকথনের সত্যতা প্রমাণ ক'রে গেলেন আপন জীবন তুচ্ছ ক'রে।

১৯৪১ সন ১৫ই ডিসেম্বর। উষার আলো প্রকাশ হচ্চে ধীরে ধীরে। অনন্ত রাত্রির অন্ধকার নামছে পেরীর জীবনে—ঘাতকদলের সম্মুখীন হ'তে চলেছেন পেরী। সৈন্যেরদল, ঘাতকের দল তীক্ষ্ণলক্ষ্যে বন্দুক উচিয়ে ধরেছে। স্থিরলক্ষ্য পেরী ধরেছেন গান, 'লা-মার্সাই'র প্রদীপ্ত স্বরভঙ্গিমায় আবেগময় হয়ে উঠেছে আকাশ। প্রথম ঝাঁক গুলি গিয়ে লাগলো পায়ে—জীবনের সমস্ত আবেগ উন্মুখর হ'য়ে উঠলো ওষ্ঠভঙ্গিতে। এতক্ষণ তিনি গাইছিলেন ফ্রান্সের জন্য, এখন গাইলেন বিশ্ব-মানবতার উদ্দেশ্যে ইনটারন্যাশনালের দুর্মর, দুর্জয় সঙ্গীত। দ্বিতীয় ঝাঁক গুলি গিয়ে লাগলো ; রুদ্ধ হ'লো সঙ্গীত ; বাঙ্ময় কণ্ঠ চিরতরের জন্য বাণীহীন হ'য়ে গেল জার্মান জল্লাদের গুলিতে। পেরীর কথা ফুরোলো কিন্তু ফুরোলো না তার অমর কাহিনী। জীবন বিসর্জন দিয়ে দেশাত্মবোধের, দেশপ্রেমের, মানব-মর্যাদার অনির্বান অক্ষয় প্রমাণ রেখে গেলেন মৃত্যুঞ্জয় পেরী। তার শেষ চিঠিই দেবে তার স্বাক্ষর।

'আমার বন্ধু, সতীর্থ সবাইকে জানিয়ে যাই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমার আদর্শে দৃঢ়নিষ্ঠ ছিলাম, অকম্প ছিলাম আমার

সত্যে। আমার দেশবাসীকেও জানাই ফ্রান্সকে বাঁচাবার জন্যই আমি আজ মৃত্যু বরণ করতে চলেছি।

'শেষবারের মতো একবার বিবেকের সঙ্গে বোঝাপড়া হ'য়ে গেছে আমার। অভ্রান্ত আমার ব্রত, অবেধ্য আমার আদর্শ; আবার যদি নতুন ক'রে জ বন আরম্ভ করতাম, ঠিক এই আদর্শ, এই লক্ষ্যই গ্রহণ করতাম জীবনে। আজ সবচেয়ে বেশী মনে পড়ছে আমার প্রিয় সুহৃদ পল ভেইলঁ্যা কুতুরিয়ের কথা। তিনি তো জ্বলন্ত সত্যই উচ্চারণ করেছিলেন যখন বলেছিলেন: 'কম্যুনিজম পৃথিবীর যৌবন সূচনা করবে, সঙ্গীতমুখর, গীতি-উচ্ছল আগামীদিন এনে দেবে কম্যুনিজম। একটু পরেই আমি চলেছি সেই গানে গানে ফাল্গুনী রচনার দিনসৃষ্টির উদ্দেশ্যে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুর্জয় শক্তিতে ভরে উঠছে আমার দেহ, সত্ত্বা।

'বিদায়, বন্ধুগণ বিদায়।

'ফ্রান্স দীর্ঘজীবি হোক—'

১৯০২ সনে তুলোঁ শহরে আমার জন্ম। আমার ঠাকুর্দার সময় থেকেই আজাসিওর (কর্সিকা) বাস উঠে গেছে। খুব অল্প বয়সেই উনি যুদ্ধ জাহাজের কেবিন বয় হ'য়ে বেরিয়ে পড়েন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে পড়াশুনা ক'রে উন্নতির ধাপে ধাপে এগিয়ে যান এবং অবসর গ্রহণ করলেন নেভি-ক্যাপ্টেন হ'য়ে। মিলিটারী ক্রশ এবং 'লিজিয়ন অব অনারের' সম্মান তিনি লাভ করেছিলেন। অবসরান্তে মার্সাই শহরে নৌ-বিদ্যা বিষয়ে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং নৌবিদ্যা শিক্ষানবিশিদের পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ করতেন তিনি। আমার ঠাকুমা ছিলেন শিক্ষয়িত্রী আর ঠাকুমার ভাই ধর্মযাজক।

আমার মা বাবা মার্সাই শহরেই থাকতেন। কোনও সওদাগরী অফিসে বাবা চাক্‌রী করতেন আর সেই সাথে ডকের শিল্পবিভাগটিও তত্ত্বাবধান করতেন। আমাদের পরিবারটিকে মধ্যবিত্তের পংক্তিতেই ফেলা চলে সুতরাং আর দশটি পরিবারের মত আমাদের পরিবারেও মিতব্যয়িতার হাওয়া বইতো। দু'টি ভাই বোন আমরা—আমিই বড়। মার্সাই শহরে লাইসে'তে আমার পড়াশুনা সুরু হয় ডিপ্লোমা পাবার পরই আমি Ecole Normale-এর উঁচু এবং কঠিন

পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হ'তে থাকি। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ বৎসরটিতে (১৯১৮) আমাদের সংসারে এক অভাবনীয় আর্থিক বিপর্যয় দেখা দিল। যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই তাই বেরিয়ে পড়লাম জীবিকার অন্বেষণে। জাহাজ কোম্পানীর একটি চাকরীর জন্য একটা পরীক্ষা পাশ ক'রে বোর্ড অব ডিরেক্টারদের সেক্রেটারীর পদ পেয়েও গেলাম। কাজটা মনের মতই হোলো বটে। কাজ আমার বিদেশী কোম্পানিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং মামলা মোকদ্দমার ব্যাপারে ডিরেক্টারদের সাহায্য করা। বাইরের প্রকাণ্ড ছনিয়াটার সঙ্গে সংযোগ গড়ে উঠলো, জীবনের পরিধি গেল বেড়ে, অনেকগুলো জানালা খুলে গেল যেন! জীবনের কত চিত্তাকর্ষক দিকের সন্ধান পেলাম। আর কি অবাধ, অফুরন্ত স্বাধীনতা !! বয়স অল্প হলেও মাইনেটা বেশ ভালই পেতাম, খুব সম্ভবত ঐ দুরূহ পরীক্ষাটি পাশ করেছিলাম বলে। এই আমার ১৯১৯ সনের জীবন।

১৯১৮ সনের শেষের দিক থেকেই নানাবিধ সামাজিক সমস্যা আমারও দৃষ্টি ও মনযোগ আকর্ষণ করে। ভাবনা স্বরু হয়ে গেল। সাম্যবাদের প্রতি আমার এই ঝোঁক, এই দুর্বলতা সামাজিক-অন্যায়-প্রসূত কোন মানসিক বিদ্রোহের ফল নয়। কিংবা বন্ধুবান্ধব অথবা পারিবারিক আবেষ্টনীর চাপে পড়ে আমি ওদিকে ভিড়েছি তাও নয়। আমার মা গোঁড়া ক্যাথলিক ; আমার ধর্মে কর্মে মতি

হোক, এদিকেই প্রখর দৃষ্টি ছিল ওঁর। আর বাবা—সাধারণ ভাবে বামপন্থীদের ভোট দিলেও নির্বাচন-প্রার্থীর ব্যক্তিত্বের মূল্যই ছিল তাঁর কাছে প্রধান। তাঁর ধারণা রাষ্ট্রের কর্ণধার হওয়া যোগ্যতমেরই সাজে এবং বামপন্থী মাত্রই যোগ্যতায় অনন্য; ১৯১৩ সনে তিনি Pams-এর পরিবর্তে পঁয়কারে (Poincaire) কে ভোট দিলেন। তার কারণ Pams-এর ব্যক্তিত্ব তাঁকে যথেষ্ট মুগ্ধ করেনি। সুতরাং পারিপার্শ্বিকে এমন কিছু ছিল না যাতে আমি বিপ্লবের পথ বেছে নিতে পারি।

সারা পৃথিবীতে তখনও যুদ্ধ চলছে এবং এই যুযুধ্যমান পরিবেষ্টনীতেই মানসিক বিকাশ ও পরিণতির পথে এগিয়ে চলছি আমি। তখন যুদ্ধই একমাত্র, অন্যতম ঘটনা। চলতে ফিরতে সর্বত্র, সব সময় একটি কথা—যুদ্ধ। কোন কিছু চিন্তা করতে গেলেই আসে যুদ্ধের প্রসঙ্গ। সুতরাং আমার চিন্তা ভাবনা, ভাবধারা সব কিছুরই একটা ছক কেটে দিয়ে যাবে এই সর্বগ্রাসী যুদ্ধ—এ আর বিচিত্র কি! সরকারী দপ্তর থেকে যুদ্ধ সম্বন্ধে যে সব কেতাব লেখা হয় সেগুলো যে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা ও কল্পনায় ভর্তি এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না আমার। তাহলে যুদ্ধের কারণ কি? খুঁজে বের করতে হবে এটা। যুদ্ধ কি শুধুমাত্র দুঃখদুর্দশারই প্রতীক, না সামাজিক উপপ্লবের সম্ভাবনাও সূচনা করে যুদ্ধ? তবে যুদ্ধ তো উপলক্ষ্য মাত্র। অন্তর্নিহিত, গূঢ় সামাজিক

উপপ্লবের অর্থ কি, কারণই বা কি, এসব সমস্যা মনে বাসা বেঁধে রইলো। ক্রমে মানব ইতিহাসের বৃহত্তর সমস্যাগুলি একে একে দেখা দিল আমার কাছে। উচ্চাভিলাষ, মদগর্ব, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি গতানুগতিক ব্যাখ্যায় মন ওঠে না আর। কারণ এ সবের কোনটাই তো যুদ্ধের মূলে নয়। অন্য সময় এবং অন্য পরিবেশ হলে আমার জিজ্ঞাসা হয়তো এত সূচীতীব্র হত না, বুদ্ধিজীবি সুলভ অস্থির জ্ঞানান্বেষায়েই সীমাবদ্ধ থাকতো হয়তো। কিন্তু আমরা যে চলেছি যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে আর যুদ্ধ শেষ হবার আগেই তো প্রচারের ফলাও চেহারা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

সুতরাং আমার জিজ্ঞাসার জবাব পেতেই হবে নইলে এই জিজ্ঞাসাই এমনি ঘাড়ে চেপে বসবে যে সমস্ত জীবনটাই দুর্বিষহ, ঘোর প্রলাপের মত হয়ে উঠবে। জীবনের অর্থ কি, আমার পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীরই বা সার্থকতা কি, এই প্রশ্ন ও সমস্যাই আমাকে পড়াশুনার দিকে ঠেলে দিলো আর এই পড়াশুনার জন্যই না স্কুলের রিপোর্টে 'আশ্চর্য্য মেধাবী ছাত্র' বলে সম্মান পেয়েছিলাম! দর্শনের পাঠ্যপুস্তকে দর্শনের বিভিন্ন শাখার সূত্রাবলী পড়বার সময় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্বন্ধে সামান্য কিছু উল্লেখ দেখতে পেয়েছিলাম। ঐতিহাসিক বস্তুবাদে ইতিহাসের ব্যাখ্যা করা হয়েছে অর্থনীতির আলোকে এবং চিন্তা (thought)—সে শুধু মানুষের নিছক মনের ব্যাপারেই নয়,

মানুষের বাস্তব অভাব ও সেই অভাব পুরণের প্রচেষ্টায় মনোজগতে যে ভাবতরঙ্গের সৃষ্টি হয় তাকেই আমরা 'চিন্তা' (thought) বলতে পারি। বস্তুজগতের সঙ্গে সম্পর্ক বিরহিত মানসিকতাকে চিন্তা বলা চলে না। ছোট্ট এই চুম্বক আলোচনাটিতে অনেক সম্ভাবনাময় ইঙ্গিত দেখতে পেলাম যেন। শুনলাম মার্কস ইতিহাসের অনুশীলনে এই বস্তুবাদী পদ্ধতি প্রয়োগ ক'রে এক বই লিখেছেন: Communist Manifesto বা 'সাম্যবাদীর ফতোয়া' নামে। পড়ে শেষ করলাম বইখানা, তাছাড়া 'ক্যাপিটালের' মুখবন্ধ ও তার টিকা খানাও পড়ে ফেললাম। গ্যাব্রিয়েল ডেভিলের প্রকাশনায় বইখানা সবে মাত্র বেরিয়েছে তখন।

কিন্তু জ্ঞানের এই অন্বেষা থেকে সহজে কি মুক্তি পাবে কেউ? আমার প্রশ্নের জবাব পেতেই হবে; পেতেই হবে আমার জিজ্ঞাসার সমাধান। যতই নতুন নতুন দিগন্তের সন্ধান পাচ্ছি ততই বেড়ে চলেছে আমার অন্বেষা-উৎসব, বেড়ে চলেছে আমার জিজ্ঞাসা "অতঃকিম"। মার্কস-এঙ্গেল্‌স্-এর 'দি হোলি ফ্যামিলি', 'অ্যান্টি ডুরিং' পড়লাম। এলোমেলো ভাবে পড়ে ফেললাম যা পেলাম হাতের কাছে। কিন্তু তার মধ্যে থেকেই এক সুক্ষ্ম সমন্বয়, এক সুষ্ঠু প্রণালী গড়ে উঠলো। সামাজিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে প্রাথমিক যে অস্বস্তি, অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেছিলাম, এই অধ্যয়নে, গবেষণায় তার কিরণ কেন্দ্র

অনেক বেশী বিস্তৃত হ'য়ে গেল। ছুনিয়ার রীতিনীতি প্রচলিত বিধি ব্যবস্থা সবই গলদ পূর্ণ মনে হলো। দৃঢ়মূল অন্যায় এবং উপায়হীন অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত এই পৃথিবীর বিস্ফোরণ অবশ্যম্ভাবী। ছুনিয়ার চেহারাটা বেশ সহজ ও স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল আমার কাছে। দেখলাম, ধ্বংসের অস্ত্রে আজ সে নিজেই শান দিচ্ছে আর সে-অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে, চালাতে পারবে এমনি সব মানুষকে এক জোট করছে, সমবেত করছে এক পতাকার নিচে। সেই সাথে এটুকুও স্পষ্ট হয়ে গেল যে সাম্যবাদের আন্দোলন আর ছু'পাঁচটা আন্দোলন এক জিনিস নয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তার রূপ, প্রকৃতি। এ আন্দোলন মানব সমাজকে নতুন ক'রে গড়ে তোলবার কাজে, কৃতনিশ্চয় মানুষের আন্দোলন।

সাম্যবাদের অনুশীলন, অধ্যয়ন ইত্যাদিতে আমার মনের অসন্তোষ কমল বটে কিন্তু এই প্রাজ্ঞিক আত্মতুষ্টিইতো সব নয়। মনের কাছে বারবার তাগিদ আসছে আমাকেও কাজ করতে হবে, আমারও কিছু দেয় আছে। সাম্যবাদী দর্শনের শিক্ষা ও আন্দোলনের অভিন্ন স্বরূপটি যত স্পষ্ট হ'য়ে দেখা দিল ততই এগিয়ে গেলাম আন্দোলনের দিকে। দীক্ষা দৃঢ় হয়ে উঠলো।

তৎকালীন বিভিন্ন সামাজিক ঘটনা ও তার ঘাত-প্রতিঘাত আমার চিন্তাধারার উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে—বিশেষ ক'রে রুশ বিপ্লব। রুশ বিপ্লবই সমাজতন্ত্রবাদের মর্মমূলে নাড়া

দিয়েছিল। সমাজতন্ত্রবাদ কি কার্যকরী হ'তে পারে? এই প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসা সৃষ্টি করলো। এই সমস্ত ঘটনা পরম্পরায় আমার জীবন-ধারা নির্দ্ধারিত হয়ে যায়। তখন পর্যন্ত ভেবেছি অর্থাৎ মনে মনে বাসনা, পছন্দমত কোন কাজ (চাকরী) নেব, সংসার পাতব স্বাচ্ছন্দ্যে, আরামে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা চলবে আর অবসর মত সাম্যবাদের কাজে নিজেকে নিয়োগ করবো। রুশ বিপ্লব এবং ১৯১৮-২০ সনের পৃথিবীব্যাপী বৈপ্লবিক পরিবেশ আমার সমস্ত কল্পনা ভেঙ্গে খান খান ক'রে দিল। চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল কত অসার, কত অবাস্তব আমার জীবনের আয়োজন ; বুঝিয়ে দিল সাম্যবাদের লড়াই, বিপ্লবের লড়াই 'অবসর মত আর দশ পাঁচটা কাজের ফাঁকে ফাঁকে' হয় না। তাকেইএকমাত্র উপাস্য ক'রে নিতে হয় জীবনে। তাই আমার জীবন-সর্বস্ব হয়ে উঠলো এ-ব্রত।

জীবনটাকে নিয়ে ছিনি মিনি খেলতে না চাইলে অন্য জিনিস-গুলো হয়ত অপ্রাসঙ্গিকই থেকে যেত। আমার জীবনে পদ মর্যাদার ব্যাপারটাও এমন কিছু নয় তবে কোনও একটা কাজ অবশ্য চাই। কি কাজ তা নিয়ে মাথা ঘামাইনে তবে আমার বিপ্লবী কাজকর্মের সহায়ক হলেই হল। সামাজিক বিচারে পদটা উচ্চস্তরের না নিম্নস্তরের তা দিয়ে আমার পদের বিচার করিনি ; আমার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় সে পদ কতটা সুযোগ সৃষ্টি করেছে বিচার করেছি তারই নিরিখে।

বছরের পর বছর ধরে যে সব কথা মনে তোলপাড় করেছে সেই অন্তর্লীন ভাবধারা কয়েকটি মাত্র কথায় প্রকাশের প্রয়াস করছি। কিন্তু বন্ধুর ও বিপদ সঙ্কুল জীবন গ্রহণ করবার যে সিদ্ধান্ত তখন গ্রহণ করেছিলাম সেটা শুধুমাত্র খেয়াল নয় কিংবা নিজেকে ছলনা করা নয়। আকাঙ্খিত ও বাঞ্ছিত জীবন গ্রহণ করবার, অন্য জীবনে ফিরে যাবার অনেক সুযোগই তখনও বর্তমান ছিল কিন্তু ফিরে যাইনি—সেসব সুযোগ একান্ত অবহেলায় দূরে ঠেলে দিয়েছি।

আমার বন্ধু বান্ধব, অধিকাংশই আমার সতীর্থ—ওরা সবাই আমার মতই চিন্তা করতো, একই ভাবনার সরিক ছিলাম আমরা। তখন সামাজিক অবস্থা অদ্ভুত উন্মাদনাময়, বিঘ্নসঙ্কুল দৈনন্দিন জীবনযাত্রা। এই বিঘ্নময়তার ভিতর দিয়েই এগিয়ে চলেছি পরিণত বয়সের দিকে। এই পরিবেশের সম্ভাবনার দিকটাও তুচ্ছ নয়। অনেক বৈপ্লবিক পরিণতির ইঙ্গিত ছিল এ পরিবেশে, হয়ত আমাদের জীবনও ফলপ্রসূ হয়ে উঠতো। চতুর্দিকেই বিপ্লবের প্রতিভাস—এই পৃথিবীবিধ্বংসী ঘটনা পরিক্রমা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা, দূরে রাখা, কেমন যেন অত্যন্ত অবমাননা-কর মনে হ'ল। নেশায় পাওয়ার মত একরকম প্রবৃত্তি পরিচালিত হয়েই যোগ দিলাম বিপ্লবের শিবিরে। বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে তুললাম চতুর্দিকে। বিদ্রোহ, বুর্জোয়া আইন শৃঙ্খলার বিরূদ্ধে, বুর্জোয়া নীতিবাদের বিরূদ্ধে, যুদ্ধে মুনাফা লুঠেরার বিরূদ্ধে, বড়

লোকের নন্দ দুলাল ও দুহিতার বিরুদ্ধে; চতুর্দিকে বিদ্রোহের জেহাদ ঘোষণা করলাম। বুর্জোয়া বিবাহ—তাকেও দিলাম নস্যাৎ ক'রে, সে তো পতিতা বৃত্তিরই সামিল! জনসাধারণের রুচি বিকৃতি ও রুচির দৈন্যের বিরুদ্ধে অক্লান্ত, অনলস আন্দোলন করেছি। ভেবেছি বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠলে সমাজের সমস্ত খাদ পুড়ে যাবে; গতানুগতিকের প্রতি, রুচিসাধারণ্যের প্রতি মানুষের ঝোঁক যাবে কেটে তখন অর্থপতির স্থলে বুদ্ধিজীবিরাই হবেন রাষ্ট্রের কর্ণধার এবং জনগণের মধ্যেও উন্নত রুচিবোধ ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্য বোধের সংবেদনা সঞ্চারিত হবে।...

গভীর পড়াশুনা ও সেই সাথে কঠোরভাবে চিন্তা ক'রে ক'রে মন আমার বিপ্লবমুখী হয়ে উঠলো। অধিকাংশ সময়ই একা একা কাটাতাম এবং আমার কার্য্যকলাপ, চিন্তাভাবনা যে অভ্রান্ত সেকথা নিজের কাছে প্রমাণ করবার জন্যই অনেক জিনিসের সংস্রব ত্যাগ করলাম, অনেক ব্যক্তিগত সম্বন্ধও ছিন্ন করলাম স্বেচ্ছায়, জীবনটাকে নিয়ে এমনি নানা রকম একসপেরিমেণ্ট করেছি। বেদনা আনন্দের অদ্ভুত দ্বৈত অনুভূতিময় সে পরিবেশ।

বুদ্ধি দিয়ে, বিচার বিবেচনা ক'রে এ পথে এসেছিলাম। আমার আকর্ষণ হৃদয়াবেগ সঞ্জাত নয়, নিতান্ত মস্তিষ্ক চালনার ফল। তবে সব দিক বিবেচনা ক'রে এবং অভিজ্ঞতার আলোয় এটুকু বুঝেছি, এ ধরণের কর্মীও (অর্থাৎ বুদ্ধি দিয়ে যারা বিপ্লবের পথ

গ্রহণ করেছেন) নেহাৎ নিকৃষ্ট শ্রেণীর কর্মী নয় আর তাদের আনুগত্যও নিশ্চিত ভাবে সন্দেহাতীত।

অত্যন্ত বিঘ্নসঙ্কুল সে সময়টা। পৃথিবীর সর্বত্র তোলপাড় চলছে। অনেকে তো নিশ্চিত হ'য়ে রইলেন যে বিপ্লবের ঢেউ রুশিয়ায় জেগেছে তারই প্লাবনে সারা পৃথিবী ভাসিয়ে নেবে। এই তো বুদাপেষ্টের দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, বিপ্লবের জোয়ার জাগেনি সেখানে? লোকায়ত্ত সরকার স্থাপিত হয় নি কি ব্যাভেরিয়ায়, ইতালীতে শ্রমিক শ্রেণী কি দখল করেনি কল-কারখানা, মিল ফ্যাকটরী? ফ্রান্সের এখানে ওখানেও বিপ্লবের ফুলকি জ্বলে জ্বলে উঠছে? ১৯১৯ সনের মে-ডের কুচকাওয়াজে যোগ দিয়ে মনে হোলো—হ্যাঁ এবার বিপ্লবের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি।

সে বছরেই সমাজতান্ত্রিক দলে যোগ দিই। কিছু কিছু সমস্যা নিয়ে জনসাধারণ অত্যন্ত সজাগ, সচেতন হ'য়ে উঠছিল; তার মধ্যে ইউরোপের পুনর্গঠনের সমস্যাটি সবচেয়ে বেশী ক'রে ভাবিয়ে তুললো আমাকে। শান্তি সম্মেলনে (Peace Conference) এই বিষয়টি নিয়ে কূটনীতিবিদেরা অনেক আলোচনা গবেষণা চালালেন; আমি দূর থেকে তাদের চিন্তা প্রণালী, কার্য্যক্রম পর্যবেক্ষণ ক'রে গেলাম; যেন এক কিশোর; ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক সবেমাত্র বন্ধ ক'রে, ইতিহাসের ঘটন সাদৃশ্যে (analogy) প্রলুব্ধ হ'য়ে স্বপ্ন দেখছে ঃ ওয়েষ্টফেলিয়ার

সন্ধি, ভিয়েনা কংগ্রেস, লীগ অব নেশনের উপর আপেক্ষিক তুলনামূলক প্রবন্ধ লিখবে অথবা কার্ডিনাল রিচলু, প্রেসিডেন্ট উইলসন, প্রিন্স ফন মেটারনিকের (স্বর্গবাস এদের পক্ষে অসম্ভব, সম্ভবতঃ নরকেই এরা স্থান পেয়েছেন) পারস্পরিক কথোপকথন লিপিবদ্ধ ক'রে রাখবে।···কিন্তু মার্কসবাদের শিক্ষা দীক্ষায় মায়া (appearance) ও সত্বার (Reality) বিরোধ ও প্রভেদটুকু বুঝবার ক্ষমতা অর্জন করেছিলাম তাই আন্তর্জাতিকতা-বাদীদের বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের (League of Nations) কল্পনা ও বিজয়ী শক্তিবৃন্দের জাতিসংঘের বাস্তব চেহারার মধ্যে বেছে নিতে কষ্ট হোলনা কিছু। দেখলাম বিজেতৃগোষ্ঠীর জাতিসংঘ জেনেভা সহরে আস্তানা গেড়ে যুদ্ধের লভ্যাংশ ভাগ বাটোয়ারার কাজে ব্যস্ত রয়েছে। আরও দেখলাম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রনের নামে, জাতীয় রাষ্ট্রের নামে, মধ্য এবং পূর্ব ইউরোপে পুলিশ-রাষ্ট্রের প্রবর্তনা হতে চলেছে। হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্য অথবা তুরস্কের সুলতানশাহী অবশ্যই আমি নতুন করে স্থাপনা করতে চাইনি।

মোট কথা, ভার্সাই সন্ধিটিকে মোটেই সুনজরে দেখিনি এবং ঐ চুক্তি মারফৎ যে শান্তির অবতারণা করা হয়েছে তা নিতান্তই অলীক ও শিথিলভিত্তি এই ছিল আমার ধারণা। এই ফাঁকা শান্তির ব্যাপারটিই আমার আক্রমনের লক্ষ্যস্থল হ'য়ে উঠলো। মার্সাই-এর সমাজতান্ত্রিক পত্রিকায় এবং 'আই-এন প্রভেসে' প্রকাশিত

এক বামপন্থী ছাত্র-পত্রিকায় এই মেকী শান্তির উপর গুটিকয়েক প্রবন্ধ লিখি। বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক ছাত্র সভায় আমি অংশ গ্রহণ করতাম, আমি নিজেও তাদের দলভুক্ত ছিলাম। প্যারিস থেকে প্রকাশিত 'ক্লারতে' পত্রিকায় আঁরি বারবুস ও পল ভেইলাঁ কুতুরিয়ের সহকর্মী ছিলাম। "জরোর (Jaures) সমাজদর্শনে ভাববাদ ও বস্তুবাদ", "ফরাসী বিপ্লব, ব্যাবুফ ও সামাজিক সমস্যা" আমার এই প্রবন্ধ দুটি "ক্লারতে" তে প্রকাশিত হয়।

১৯১৯ সনের নির্বাচন ও ১৯২০ সনের ধর্মঘটের উপর খুব সতর্ক দৃষ্টি ছিল আমার, কারণ এই ধর্মঘট সংশ্লিষ্ট সমস্যা গুলি অত্যন্ত জরুরী এবং অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনে সমাজতন্ত্রীদলের পরাজয় এবং ধর্মঘটের বিপর্যয়ে বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহ বোধ করিনি। এই অসাফল্যের এবং বিপর্যয়ের মূলে ছিল সমাজতান্ত্রিক দলের কয়েকটি ত্রুটি। চারিত্রিক গঠনে দোদুল্যমানতা ও উৎসাহের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে, ১৯১৪-১৮ সনের রাজনীতি এরা পরিবর্জন করতে পারেনি। তাছাড়া ১৯১৭ সনের অক্টোবর বিপ্লবে যে ধরণের বিপ্লবী কর্মী অংশ গ্রহণ করেছিল, সমতুল্য বিপ্লবীকর্মীর অভাব ছিল ফরাসী সমাজতান্ত্রিকদলে। সুতরাং পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে আমাদের প্রচেষ্টা যে দ্বিগুণ করতে হবে এ বিষয়ে স্থির নিশ্চয় হই এবং আমার মতে একটি

মাত্র পথেই চলতে হবে আমাদের,—সে-পথ বিজয়ী বলশেভিকদের বেছে নেওয়া পথ।

বিভিন্ন দেশের জাতীয় অবস্থা এবং পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা করা দরকার এই প্রাথমিক সত্য আমি উপলব্ধি করেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে হয়েছিল যে, মহান বলশেভিক-বাদ থেকে যদি আমরা শিক্ষা গ্রহণ না করি, অনুপ্রেরণা না পাই, তবে সেটা নিতান্তই বাতুলতা হবে, হাস্যকর হয়ে উঠবে সমস্ত ব্যাপারটা। আমি তো এইভাবে চিন্তা করেছি যে সমাজতন্ত্রীদের লক্ষ্য ধনতান্ত্রিক সমাজের স্থলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা এবং সমাজতন্ত্রীদলের সংগ্রাম এই রদবদলেরই সংগ্রাম। এক্ষেত্রে যে আন্দোলন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বংস ক'রে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করেছে বা করছে তাকে বাদ দিয়ে কিংবা দূরে সরিয়ে রেখে সমাজতন্ত্রীদলের স্বপ্রতিষ্ঠভাবে সমাজ-তান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা একান্তই অসম্ভব।

এই কারণেই সমাজতন্ত্রীদলের অতিবামপন্থীদের সঙ্গেই নিজেকে যুক্ত করলাম। কম্যুনিষ্ট তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অনুমোদন-প্রার্থী ছিল এই দলটি।

ফ্রান্সে কম্যুনিষ্ট পার্টির জন্ম ইতিহাস মোটামুটি এই।

এই নবগঠিত পার্টির ভিতরে থেকে আমি ও আমার কয়েকটি বুদ্ধিজীবি বন্ধু নিয়মিতভাবে কয়েকটি পত্রিকার সঙ্গে সংযোগ

স্থাপন করেছিলাম। ফ্রান্সের যুব কম্যুনিষ্ট লীগের মুখপত্র আভাণ্ট গারর্ড (Avant Gard)এর নিয়মিত লেখক ছিলাম আমি। 'ল্যুমানিতে'-তেও আমার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এসব ছাড়াও আরও কাজ ছিল আমার। অফিসের কাজের ফাঁকে অবসর পেলেই যুব-কম্যুনিষ্ট লীগের জন্য সভ্য সংগ্রহের কাছে নেমে পড়তাম।

১৯২১ সালে ফরাসী-সীমান্তের ঘটনাপ্রবাহ আমার কাজের উৎসাহ, উদ্দীপনা দ্বিগুণ ক'রে তুললো। সেই সময়কার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা জার্মান সরকারের কাছে ফরাসী সরকারের রাজনীতিক অনুমতি (sanction) প্রার্থনা। রাইনল্যাণ্ডের শহরগুলি দখল করা হল এবং ১৯১৯ সনের মিলিটারী ক্লাসের ডাক পড়লো ফৌজে যোগ দেবার জন্য।

প্রকাশ্য সভায় এবং স্থানীয় বামপন্থী পত্রিকা মারফৎ আমি এই সর্বনেশে নীতির প্রচণ্ড বিরোধিতা করি। কারণ, আমার মতে এই নীতি প্রয়োগের অর্থ জার্মানীর প্রগতিশীল শক্তিকে ধ্বংস করা এবং এ কথা একান্ত ধ্রুব যে এই ধরণের নীতির ফলে তীব্র জাত্যাভিমান (chauvinism) ও জাতিবৈরী গড়ে উঠবে। আমার ধারণা জার্মানীতে ফ্যাশীধর্মী প্রতিক্রিয়াপন্থীদের অভ্যুত্থান সমগ্র ইউরোপের পক্ষেই এক অশুভ বিপদজনক পরিস্থিতির সূচনা করবে।

সুতরাং এই পরিস্থিতির অবসান চাই-ই। মার্সাইএর যুব-কম্যুনিষ্ট মহলে ইস্তাহার বিলি সুরু ক'রে দিলাম। জার্মানীর বিরুদ্ধে নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা চলবে না; 'ফরাসী জার্মানীর শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ'। আমার কর্মতৎপরতার সরকারী পুরস্কার অধিকতর তৎপরতার সাথেই পেয়ে গেলাম। ১৯৩১ সালের বসন্তকালেই হুকুম এলো আমার কারাবাসের। আমার বয়স তখন কুড়ি বছর মাত্র। দিন ষাটেক জেলে ছিলাম। সেও তো আজ বছর কুড়ি আগেকার কথা; ১৯২১ সনে জার্মানী-দখলকারী বিজয়ী ফ্রান্সের বিচারকর্তাদের যেসব কথা শুনিয়েছিলাম, হুবহু সেই কথাই (কেবলমাত্র সর্বণামগুলো একটু অদল-বদল ক'রে) আজ বিজিত, অবরুদ্ধ ফ্রান্সের বিচারকর্তাদের শোনাতে চাই।

আমার গ্রেফতার, বিচার, সাজা ইত্যাদির ফলে আমার পারিবারিক জীবনে যথেষ্ট অসুবিধার স্থষ্টি হয়েছিল সন্দেহ নাই কিন্তু আমার মা বাবা কোন মুহূর্তের জন্যও আমার কার্য্যকলাপে সন্দেহ প্রকাশ করেন নি। তারা জানতেন আমি স্রোতের টানে গা ভাসিয়ে দিইনি কিংবা নিছক গোয়ার্তুমি করছি না। আমার ধ্যানধারণায়, আমার স্ব-নির্বাচিত জীবনযাত্রায় তাঁরা আস্থাশীল ছিলেন, তাই আমাকে পদচ্যুত, আদর্শভ্রষ্ট করবার চেষ্টা কখনই করেন নি তাঁরা।

জেল থেকে মুক্তি পাবার পর আমার চাকরিটি আমি ফিরে

পাই। (অবশ্য তখনকার আবহাওয়ায় জেলে যাওয়াটা সম্মানকর ব্যাপার ছিল) জেল থেকে বেরিয়েই আবার সুরু হোলো কম্যুনিষ্ট পার্টির কাজকর্ম। ১৯২২ সনে আমার কারাবাস বিচার ইত্যাদির এক বছর পরে ফরাসী কম্যুনিষ্টপার্টির নেতৃস্থানীয়েরা আমাকে ফরাসী যুব-কম্যুনিষ্ট লীগের সম্পাদক হতে অনুরোধ জানান।

কিছুদিন ধরে চললো মন স্থির করার পালা ; ইতস্ততঃ করছি মার্সাই ছেড়ে যাব কি না। তাছাড়া সর্বক্ষণের জন্য পার্টিকর্মী হবার ব্যাপারে একটু দ্বিধা দেখা দিল মনে। এতদিন যে স্বেচ্ছামূলকভাবে, আপন প্রাণের আবেগে পার্টির কাজ ক'রে এসেছি! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হোলো সর্বক্ষণের জন্য পার্টিকর্মী না হওয়ার অর্থ পার্টির কাজের দায়িত্ব এড়ানো। সুতরাং বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী ঐ পদটি গ্রহণ না ক'রে পারলাম না—চলে এলাম প্যারিসে।

যুব-কম্যুনিষ্ট লীগের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'আভাণ্ট গার্ড' সম্পাদনা ও পরিচালনা করাই ছিল আমার প্রধান কাজ। প্যারিসের লা ক্রোসাঁ (Le´ Croissant) পাড়াটির সঙ্গে এই প্রথম পরিচয় হল—তারপর এখানেই কেটেছে আমার জীবনের সমৃদ্ধ ও আবেগআবিষ্ট পনেরটি বছর। কত নতুন জীবনের সঙ্গে পরিচয় হলো—মুদ্রাকর, প্রুফরিডার, 'অক্ষর সাজানী',—সে এক নতুন জগতের সঙ্গে পরিচয়। কম্যুনিষ্ট সাংবাদিক হিসেবে

শিক্ষানবিশি, হাতেখড়ি সুরু হয় আভাণ্টগার্ডের অফিসে। ফ্রান্স ও প্রতিবেশী রাষ্ট্র-সমূহের কম্যুনিষ্ট ও সমধর্মি যুবসংগঠনগুলির সঙ্গে সংযোগ এবং পারস্পরিক সম্বন্ধ রক্ষার দায়িত্বও ছিল আমার উপরে। আমাকে তাই মাঝে মাঝে ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি জায়গায় যেতে হোত কিন্তু সবচেয়ে বেশী যেতাম জার্মাণীতে। ফ্রান্স ও জার্মানীর প্রগতিপন্থী যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন, সেতুবন্ধরচনা আমার কাছে একান্ত অপরিহার্য্য মনে হয়েছিল। কারণ এই মৈত্রীর মাধ্যমেই, এই সেতুবন্ধের সূত্রেই জার্মানীর প্রতিহিংসামূলক যুদ্ধপ্রস্তুতি ও আমার নিজের দেশের নিপীড়িনপন্থী মনোভাব দূর করা সম্ভব।

এই উদ্দেশ্যে যুব-কম্যুনিষ্টলীগের ন্যাশনাল কমিটির কমরেডদের সঙ্গে অবরোধবাহিনীর (army in occupation) ফরাসী সৈন্যদের মোলাকাত করিয়ে দিলাম। পুস্তিকা ও প্রচারপত্রের মারফৎ তাদের কাছে আবেদনের পর আবেদন পাঠাতে লাগলাম—তারা যেন জার্মানদের দিকে সাহায্যনিবিড় হাত বাড়িয়ে দেয়, হাতে হাত মেলায় তাদের সঙ্গে, সম্ভব-ক্ষেত্রে তাদের বিপ্লবের সাহায্যও করে। কী সাংঘাতিক বিপদ মাথায় নিয়ে সে সব কাজ করতে হয়েছে! প্যারিসের উত্তর স্টেশন 'গার-ডু-নর' থেকে যখন অবরুদ্ধ এলাকার উদ্দেশ্যে ট্রেনে চেপেছি তখন আমাদের সবাই জানতাম কী নিশ্চিত বিপদের মুখে স্বেচ্ছায় এগিয়ে চললাম আমরা। তা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে

কাড়াকাড়ি পড়ে যেত 'কেবা আগে প্রাণ করিবে দান'—আর সব সম্মানের বাড়া যে এই কাজ! ফরাসী-জার্মান মৈত্রী সম্বন্ধে এমনিভাবে চিন্তা করেছিলাম আমি। আজ একটা প্রশ্নই বার বার মনে জাগে—প্রায় কুড়ি বছর আগে বিজিত জার্মানীর প্রতি সুবিচার দাবী ক'রে আমি যে দুঃখ কষ্ট বরণ করেছিলাম, আজ ১৯৪০ সনের জুন মাসে কতজন ফরাসী 'ব্রাউন সার্টের' আড়ালে এমনি অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে?

এতটুকু স্বস্তি ছিল না সমস্ত পরিবেশে, 'আভাণ্ট গার্ডের' ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লেগেই থাকতো। ১৯২২ সনে ফ্রান্সের মিলিটারী ক্লাসের উপর নির্দেশআসে ফৌজে যোগ দেবার। সঙ্গে সঙ্গে 'আভাণ্ট গার্ডে'র, একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ ক'রে ফেললাম—'দি রিক্রুট', উল্লেখযোগ্য তিনটি প্রবন্ধ ছিল—মার্সেল কাচিন, ভেইলঁ্যা কুতুরিয়ের এবং আমার। তিনজনেই আইনে অভিযুক্ত হলাম। আমাদের কৌসুলী আঁরি তোরে, বারথঁ এবং আর্ণেষ্ট লাফোঁ সিভিলকোডের বুক ২, প্যারা ৯, ক্লজ ২৯, আর্টিকেল ৩৭৮ অনুযায়ী বিচারক লামারদিসয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। উপরোক্ত আইনের ধারা অনুযায়ী প্রাথমিক অনাস্থার (fundamental prejudice) অজুহাতে কোনো বিচারককে অগ্রাহ্য করা চলতো কিন্তু বিষয়বস্তু ও প্রয়োগবিধি উভয়তঃই আমরা দোষী সাব্যস্ত হই। ১৯২৪ সনে রাজক্ষমার (amnesty) ব্যাপারটি চুকে যাবার পর আমাদের

সাজা দেবার সময় আসে। এতেই বোঝা গেল আমাদের দোষ কোন মতেই ক্ষমার্হ নয়।

১৯২২ সনে ইয়ং কম্যুনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনালের আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে ফ্রান্সের তরফ থেকে প্রতিনিধি হয়ে মস্কো যাই। একমাস ছিলাম, দুটি বক্তৃতা দিই সেখানে। প্রথম বর্ত্তৃতা দেই বিপ্লবী লেখকচক্রে "প্রথম মহাযুদ্ধ ও পরবর্তীকালীন ফরাসী প্রগতি সাহিত্য" -এর উপর অন্যটি দেই নাবিকদের ক্লাবে "প্যারি কম্যুন" এর উপর। মস্কো অবস্থানকালে সেখানকার খবরের কাগজে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখি। লেনিন ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

প্যারিসে ফিরে এলাম। 'ইণ্টারন্যাশনাল প্রেস-করেসপনডেন্স্ থেকে ডাক এলো, বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে এই পত্রিকাটি একাধিক ভাষায় জুরিখ থেকে প্রকাশিত হত। রোম এবং ইতালীয় অন্যান্য উলেখযোগ্য শহরগুলিতে রাজনৈতিক অবস্থা সরেজমিন তদন্ত করার জন্য আমাকে অনুরোধ জানায়। ফ্যাশী শত্রুদের হাতে কতবার যে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছি! তবে লাভের চেহারাটাও নেহাৎ মন্দ নয়। ফ্যাশীবিরোধী বহু নেতার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, এমন কি মুসোলিনীর "গোপন চক্রে"ও প্রবেশের পথ ক'রে নিয়েছিলাম।

প্যারিসে ফিরে আরও শুনলাম পঁয়কাঁরে রুর (Ruhr) অবরোধের আদেশ দিয়েছেন এবং মার্সেল কাচিন প্রমুখ

কয়েকজন কম্যুনিষ্ট নেতা গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাদের অপরাধ—ফরাসী সরকারের এই রুর নীতির বিরোধিতা এবং ইসেন শহরের জার্মান নেতাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ক'রে জার্মাম জমি দখলের বিরুদ্ধে যুক্ত আবেদন প্রকাশ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার কর্ত্তব্য স্থির ক'রে ফেললাম আমি। রুর সম্বন্ধে এই ভ্রান্ত ও বিরুদ্ধ মনোভাব দূর করতেই হবে রুরের কথা জনসাধারণকে জানাতে হবে। তাই তাদের উপযোগী করে রুর নীতি ও ফ্রান্সের শ্রমিক শ্রেণী' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করি। তাতে ভার্সাই চুক্তির সময় থেকে আরম্ভ ক'রে 'ক্যানে (Cannes) বৈঠক' (১৯২২) এবং পঁয়কারের ক্ষমতা গ্রহণ অবধি ফরাসী- ব্রিটিশ ও ফরাসী-জার্মান সম্বন্ধের একটি পূর্বাপর ছবি দেখাই। রুর অবরোধের দুমুখো চেহারা জনসাধারণের কাছে জানিয়ে দেবো এটাই ছিল আমার ইচ্ছা। এ নীতির একদিকে 'কমিটে দ্য ফরজে', কে লাভবান করবার অর্থনৈতিক অস্ত্র অন্যদিকে জার্মানীর প্রগতিপন্থী শ্রমিক শ্রেণীকে দাবিয়ে রাখবার প্রতিক্রিয়া-পন্থী হাতিয়ারও বটে। এ নীতি কখনই ফ্রান্সের জাতীয় স্বার্থের অনুকূল হতে পারেনা বরং পঁয়কারের এই নীতির যূপ কাষ্ঠে বলিদান হবে ফ্রান্সের জনসাধারণ কারণ প্রথম আঘাতে ভাঙ্গবে ফ্রান্সের মুদ্রাব্যবস্থা আর তারই ফলে অর্থস্ফীতির সর্ব্বনেশে বাণ ডাকবে দেশের বুকে। জার্মানী ও সোভিয়েটের সঙ্গে মন কষাকষি তো আছেই, তার

উপর সম্প্রতি আবার অ্যাংলোস্যাকসন জগতের সঙ্গে তার দোস্তি ঘুচেছে। সুতরাং একেবারেই বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়বে ফ্রান্স। সব শেষের কথা হলো জার্মান জমি দখলের এই নীতি কি জার্মান জাতির বুকে প্রতিহিংসার আগুন ও জিঘাংসা বৃত্তি জাগিয়ে তুলবে না? নিশ্চয়ই তুলবে।

এবং সত্য সত্যই জানা গেল রুর ব্যাপারের কয়েক মাস পরেই ল্যাণ্ডস্‌বার্গ দুর্গে বন্দী হিটলার তার 'মেইন কাম্ফ' লিখতে শুরু করে।

পঁয়কারে ও তাঁর 'ন্যাশনাল ব্লক' এর সম্পূর্ণ বিরোধী একটি নীতি আমি গ্রহণ করেছিলাম। তার কাঠামোটি মোটামুটিভাবে এই যুদ্ধঋণ এবং যুদ্ধসংক্রান্ত যাবতীয় খরচ যুদ্ধের জন্য সমভাবে দায়ী দেশগুলির বিত্তবান সম্প্রদায়ই বহন করবে। তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ক'রে নয়ত সম্পত্তির উপর খুব চড়াহারে কর বসিয়ে (capital levy) ঘাটতি পূরণ করা হবে। যুদ্ধের ভগ্নস্তূপ থেকে নতুন জীবন গড়ে তুলবে ফ্রান্স ও জার্মানীর জনগণ এবং শান্তিকালীন পারস্পরিক সহযোগীতায় ভার্সাই সন্ধির কলঙ্ক দেবে নিঃশেষে মুছে। ফ্রান্সের জাতীয় স্বার্থ যে একান্তভাবে সমাজতন্ত্রী জার্মানীর সাথে বাঁধা, সমাজতন্ত্রী জার্মানীর অভ্যুত্থান ও অভ্যুদয়েই সূচিত হবে ফ্রান্সের সৌভাগ্য, কল্যাণ। ফ্রান্স, জার্ম্মানীর শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য এবং সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে এই দুই দেশের রাখী বন্ধন বিশ্বজনের

সমর্থন ও সংবেদনায় সাড়া তুলবে, এই ছিল আমার বিশ্বাস এবং এই পথেই আসবে শান্তি, আসবে মুক্তি। অর্থ নৈতিক পুনর্গঠন, নিরস্ত্রীকরণ, কখনই সম্ভব হবে না যদি না এই তিন দেশের সৌভ্রাত্র বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

যারা আমার এই নীতিকে চরমতম দেশদ্রোহিতা ব'লে অভিহিত করেছিল তারা যে নেহাৎ স্বার্থবুদ্ধিশূন্য হয়ে একাজ করেছিল তা নয়। তাদের নগদ পাওনা বেশ ভালই মিলেছে। আজ তারা নাৎসীদখলকারীদের সাথে হাত মিলিয়েছে—শত্রু-পক্ষের সাহায্য করছে বিভীষণের নির্লজ্জতায়। তাদেরই দৌলতে এরা আজ উচ্চপদে আসীন।

অনেক পত্রিকা এবং অনেকেই এ ব্যাপারে দোষী। যে সব কাগজ রুর নীতির অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিল, নির্লজ্জভাবে সমর্থন করেছিল রুরনীতিকে 'লা মাতিন' তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। আর নাম করা যায় মঁসিয়ে পেরেত্তি দেলারোকার—এর গুণের শেষ নেই। ক্যানে প্রস্তাব ব্যর্থ হবার মূলেও ইনিই, ইনিই পঁয়কারেকে ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন, তার চণ্ডনীতির অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন। পঁয়কারের সময় তিনি ছিলেন মিলেরাঁ-র পরামর্শ দাতা। পেরেত্তি তাঁর এই অদ্ভুত কর্মতৎপরতার (!) জন্য ১৯৪১ সনে পুরস্কার লাভ করেন। ঐ বৎসর আগষ্টমাসে ভিসি ফান্সের হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন পেরেতি দেলারোকা।

১৯২৩ সনের জানুয়ারী মাসে আমার পুস্তিকাটি লেখা হয়। এর কিছু মালমসলা নিয়ে "ফ্রান্সের যুবশক্তির উদ্দেশ্যে" এবং "যুবশ্রমিক ও সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে"—দুটি ফতোয়া প্রকাশ করি। রুর প্রদেশে প্রচুর সংখ্যায় বিতরণ করা হয়েছিল পুস্তিকা দুটি। অবরোধকারী সৈন্যদের ব্যারাকে পর্যন্ত এদের অনুপ্রবেশ আটকানো যায়নি। ১৯২৩ সনের জানুয়ারী মাসে কে এক বিচারক জোসেলিন আমার গ্রেপ্তারের পরোয়ানা জারী করে। ১৮৯৪ সনের প্রেস আইন লঙ্ঘন ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে কারারুদ্ধ হলাম—লা সাতঁ জেলের রাজনৈতিক বিভাগে। সেলে বসে, ছদ্মনামে বিভিন্ন যুবসংগঠনের কাগজের জন্য লেখা চালিয়ে গেলাম। কিন্তু সর্বোপরি মনোনিবেশ করলাম যুদ্ধোত্তরকালীন কূটনীতিক ইতিহাসের তথ্যানুশীলনে।

১৯২৩ সনের এপ্রিল মাসে ফরাসী মন্ত্রী পরিষদ সিদ্ধান্ত করে—(১) ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচারের ভার সিনেটের উপর ন্যস্ত হবে। এক্ষেত্রে হাইকোর্টের অনুরূপ ক্ষমতা থাকবে সিনেটের। এবং (২) হাইকোর্টের অধিবেশন না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিরা সাময়িক ভাবে ছাড়া পাবেন।

'লাসাতেঁ'র রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে একজন জার্মানও ছিলেনই, হোয়েলিম। ইনি স্যাকসনি প্রাদেশিক পার্লামেণ্টের ডেপুটি। ফরাসী পুলিশ এঁকে প্যারিসে গ্রেপ্তার করে।

হোয়েলিমকে ছেড়ে দেবার ইচ্ছা সরকারের আদৌ ছিল না কিন্তু তিনি একাই আবার আসামী হিসেবে 'লা সাঁতে' তে থাকবেন এও সরকারের অভিপ্রায় নয়। ষড়যন্ত্র এবং ১৮৯৪ সনের আইন ভঙ্গের অপরাধে অভিযুক্ত আমি জেলে হোয়েলিমের সঙ্গী হলাম। দশদিন পর, আমাদের এই অবৈধ আটকের প্রতিবাদস্বরূপ আমরা তুজনেই অনশন শুরু করি। অনশনের এগার দিন পরে আমাদের কাচিন হাসপাতালে নিয়ে কৃত্রিম উপায়ে খাওয়ানো হয়। কিছুদিন পর আবার আমাদের 'লা সাঁতে' তে ফিরিয়ে আনা হলো। আমাকে মুক্তি দিয়ে দেয় কিন্তু হোয়েলিমের মুক্তির কোন খবর পেলাম না। অথচ তার মুক্তিও চাই। সুতরাং ঐ জার্মান ডেপুটির স্বপক্ষে জনমত গড়ে তোলাই আমার একমাত্র চিন্তনীয় বিষয় হ'য়ে দাঁড়াল। কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলাম হোয়েলিমের কারাবাসের কলঙ্কময় অধ্যায় যতদিন না শেষ হয় ততদিন আমিও জেল ছেড়ে নড়বোনা। জেল কর্তৃপক্ষের আদেশ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে আমার সেলে অনড়, অটল হয়ে বসে রইলাম আমি। কর্তৃপক্ষ পুলিশ আমদানী করলো, জোর করেই আমাকে জেল থেকে বের ক'রে দেবে।

কাগজে কাগজে ছেয়ে গেল এই খবর। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই মুক্তি পেলেন হোয়েলিম।

এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে কোন আত্মমর্যাদা

সম্পন্ন স্বাধীন জাতি অন্য জাতির উপর উৎপীড়ন চালাতে পারে না। উৎপীড়ক জাতি কখনই 'স্বাধীন' বলে পরিগণিত হতে পারে না। ১৯২৩ সনে আমার বিভিন্ন কার্যক্রমে এই ভাবধারাই প্রকাশ পেয়েছে। আমার এই যুক্তি, এই চিন্তাধারা বর্তমান কালের পক্ষেও সমভাবেই প্রযোজ্য।

আমার মুক্তির কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমি নিম্‌স্‌ (Nimes)-এ আসি। নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে 'ল্যুমানিতে'-র একটি প্রাদেশিক সংখ্যা এখান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকার সঙ্গে সংযোগ ক'রে নির্বাচনের কাজে নেমে পড়লাম। আমি নিজে প্রার্থী নই, কারণ সে-বয়স তখনও হয় নি আমার। কম্যুনিষ্ট সদস্যদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বক্তৃতা সফরে ঘুরে বেড়াতাম। বামপন্থী Cartel বিরোধিতা ক'রে কৃষক ও মজুরদের সংযুক্ত সংস্থার জন্য জনমত উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিলাম, কারণ ঐ cartel গুলোর অন্তঃসারশূন্যতা ও দেউলিয়া রূপ আমার অজ্ঞাত নয় এবং ঐ Cartelগুলো যে নিশ্চিতভাবে ব্যর্থ হবে এও আমি জানতাম। নির্বাচনী সফরকালে এডোয়ার্ড দালাদিয়ের-এর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়। রাজনীতির অনেক ঘাটের জল খেয়ে তিনি আজ র‍্যাডিক্যাল সোস্যালিষ্ট হয়েছেন। 'ভক্লো' জেলায় বিভিন্ন সভাসমিতিতে তার সঙ্গে আমার প্রাচণ্ড বাক-বিতণ্ডা হয়েছিল।

১৯২৪ সন, অক্টোবর মাসে আমি প্যারিস 'ল্যুমানিতে'-র

বৈদেশিক সম্পাদক হই। ১৯৩৯ সনের আগষ্ট মাস অবধি সেই পদেই আসীন ছিলাম। গুরু বলতে সত্যিই যা বোঝায় সেই হিসেবে আমার দু'জন গুরু ছিলেন। অর্থাৎ তাঁদের অন্ধ অনুকরণ, অনুসরণ করা, হুকুমের দাস হওয়া—এ হিসেবে গুরু নন,—তারা যথার্থই অধিগুণসম্পন্ন ছিলেন। মার্সেল প্রুস্তের ভাষায় বলি—তাঁরা আমাকে 'মহত্বের' কয়েকটি রহস্যের সন্ধান দিয়েছিলেন। মার্সেল ক্যাসার অনাবিল অকৃত্রিম স্নেহ—আর কুতুরিয়ে তো মৃত্যুর দিন অবধি আমাকে আপন ভাইয়ের মত দেখেছেন। জীবননিষ্ঠ, সংবেদনশীল, সৌন্দর্য্যপিয়াসী আমার এই দুটি সাথী আমার জীবনে একান্ত হ'য়ে উঠেছিলেন। আমি তাদের ভালবেসেছি।

সাংবাদিকতাবৃত্তিকে যে তার যথার্থরূপে গ্রহণ করতে পেরেছিলাম তার জন্যও এঁদের কাছে ঋণী আমি। স্বর্গত আদ্রিয়েন হেবার্ড বলতেন—আমাদের কাজের দুটি উদ্দেশ্য, জানা এবং জানানো। 'যা জানি যথেষ্ট জানি,' 'যা শিখেছি যথেষ্ট শিখেছি' এমনি মনোভাবে সন্তুষ্ট থাকতে দেয় না বলেই সাংবাদিকতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। প্রতিনিয়তই আমাকে জ্ঞান সঞ্চয় করতে হবে, শিখতে হবে, জানতে হবে এবং জানার আগ্রহটা অটুট রাখতে হবে। আমার বৃত্তিই আমার ব্রত হ'য়ে উঠলো। বৈদেশিক ঘটনাবলীর উপর দৈনন্দিন প্রবন্ধ লেখা—এটাই হল আমার প্রতি রাত্রের ধর্মাচরণ, ব্রতের অঙ্গ।

১৯২৫ ও ১৯৩৯ সনের এর মধ্যে যাবতীয় বড় বড় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আমি বৈদেশিক সংবাদদাতা হিসেবে যোগ দিই। লোকার্ণো (১৯২৫) সংযুক্ত ইউরোপ সম্মেলন (১৯২৮) নিরস্ত্রী-করন সম্মেলন (১৯৩২) লণ্ডন নৌ সম্মেলন (১৯৩০), আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলন (১৯৩২), মনট্রো সম্মেলন (১৯৩৬) সাবমেরিন যুদ্ধ সম্বন্ধে নিয়ম সম্মেলন (১৯৩৭) রাষ্ট্রসংঘের সমস্ত অধিবেশনেই আমি উপস্থিত ছিলাম। ১৯২৮ সনে ফরাসী ও বিদেশী সংবাদপত্রের সহকর্মী বন্ধুগণ আমাকে জাতিসংঘের সংবাদপত্রসেবীসমিতির প্রতিনিধি হ'তে অনুরোধ করেন। সমিতির উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন হাভাস এজেন্সীর প্রতিনিধি লাতাঁ (Le Temps)-র প্রতিনিধি আর ছিলেন অগাষ্ট গেভাই-'জুর্নাল ড ডেবা' (Journal des Debats)র বিশেষ প্রতিনিধি। ফরাসী রাষ্ট্রদূত দ্য জুভনেল আমাকে সমিতিতে স্বাগত জানালেন এবং আমার নির্বাচনে হর্ষ প্রকাশ ক'রে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন!

ফ্রান্সের বাইরেও আমি কিছু কিছু রাজনৈতিক সফর ও তথ্যানুসন্ধান করি। ১৯২৮ সনে আমার বলকান সফরের উপর একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধপ্রকাশিত হয়। বলকান অঞ্চল সফরকালে অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর মঁসিয়ে সিপেল, ক্রোটিয়ার কৃষক পার্টির নেতা ষ্টেফান রাডিচ, জুগোশ্লাভিয়া ও বুলগেরিয়ার প্রধান মন্ত্রী প্রিবিচেভিচ ত্সানকফের সাথে পরিচয় হয়। ১৯৩১ সনে,

সাধারণতন্ত্র ঘোষিত হবার কিছুদিন পরেই আমি স্পেনে যাই। অন্যান্য বিষয়ের প্রসঙ্গক্রমে স্পেনীয় প্রেসিডেণ্ট ফ্রানসিস্কো মেসিয়ার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের বিবরণীটি প্রকশিত হয়। সেই বছরেই ইংলণ্ডে ম্যাকডোনাল্ডের দ্বিতীয় শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট পতনের পর 'ইংলণ্ডে ঝড়' শিরোনামায় 'ল্যুমানিতে'-তে একটি ধারা বাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলাম। ব্রিটিশ প্রেসে তার ব্যাপক মুদ্রন হয়। ১৯৩৪ সনের গোড়ার দিকে সাইগণের কয়েকজন আইনজীবির অনুরোধে ও আমন্ত্রনে সাইগন গেলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল টংকিনের গোলমাল ঠাণ্ডা করবার জন্য যে সব দমন-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল তার প্রকৃত স্বরূপ অনুসন্ধান করা। ইন্দোচীনে পা' দেবার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী ঔপনিবেশিক কর্তারা গরম হ'য়ে উঠলেন। সেখানে থাকতে কত ভীতিপ্রদর্শক চিঠিপত্রই না পেয়েছি! কিন্তু আমার কর্তব্য কর্ম থেকে, তথ্যানু-সন্ধানের কাজ থেকে, ওরা নিবৃত্ত করতে পারেনি আমাকে। বেশ ব্যাপক পরিধি নিয়েই অনুসন্ধানের কাজ চলে। ফ্রান্সে ফিরে আমার সুদীর্ঘ প্রবন্ধাবলীর ভিতর দিয়ে ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসনের ভয়াবহ ছবি জনসমক্ষে তুলে ধরি। একটা কথা বার বার জোর দিয়ে বলেছি যে ইন্দোচীনে আনামীদের পৃথক ক'রে রেখে ফরাসী সরকার সেখানকার অবস্থা আরও জঘন্য করে তুলছে। সুদূর প্রাচ্যের বহু পত্রিকায় আমার এই সব প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হয়।

১৯৩৪ সনে অক্টোবর মাসে আমি আবার স্পেনে যাই, ঠিক বার্সিলোনা, মাদ্রিদ ইত্যাদি অঞ্চলে বিক্ষোভের পরেই। ঐ অঞ্চলে কিছু কিছু বৈপ্লবিক বিক্ষোভ দেখা দিলেও কোন ফলপ্রসূ হয় নাই সে বিক্ষোভ। "দুই যুদ্ধের অন্তর্বর্তী স্পেন" এই ধারাবাহিক প্রবন্ধে আমি গনতান্ত্রিক শক্তির বিপ্লব সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম—১৯৩৬ সনে ফেব্রুয়ারী মাসে সত্যিই তা সংঘটিত হ'ল।

উত্তর আফ্রিকায় জার্মান ও ইতালীয় ফ্যাশী শক্তির বিপজ্জনক কার্যকলাপের অনুসন্ধানে ১৯৩৭ সনে আগষ্ট মাসে আলজেরিয়া, টিউনিসিয়া, ফরাসী-মরক্কো প্রভৃতি জায়গায় গেলাম। ডিসেম্বর মাসে আইন পরিষদে বৈদেশিক কমিটির (Foreign Affairs Committee of the Chamber of Deputies) কাছে বিবরণী পেশ করবার সময় প্রধান মন্ত্রি আলবার্ট সরাট অকুণ্ঠ, অকৃপণভাবে আমার কাজের প্রশংসা করেন এবং সেই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করেছিলেন যে আমার আহৃত তথ্যাদি নাকি ফরাসী সরকারকে প্রভূত উপকার করেছে। ১৯৩৮ সনে মে মাসে আমি চেকোশ্লোভাকিয়ায় যাই। প্রেসিডেণ্ট এডোয়ার্ড বেনেস ও বৈদেশিক মন্ত্রী ক্যামিল ক্রোফ্‌টা আমাকে স্বাগত জানান। চেক সামরিক অফিসার ক্লাব আমাদের যথেষ্ট আপ্যায়িত করে। চেকোশ্লোভাক সংবাদপত্রের সহকর্মীরা এক

নিমন্ত্রণসভার আয়োজন করেন। প্রাগে ইউনিভার্সিটী ছাত্রদের কাছে এক বক্তৃতা দিই আমি।

বৈদেশিক বিষয়ের উপর আমাকে প্রতিদিনই লিখতে হতো আর আমার এই সব প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দেখতে পেতাম প্যারিস ও ফ্রান্সের অন্যান্য শহরের সংবাদপত্রে। 'ল্যুমানিতে' ছাড়াও অন্যান্য পত্রিকার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। ফরাসী কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপত্র "কাইয়ে ছ্য বোলসেভিজমে"তে প্রতি মাসেই আমার প্রবন্ধ থাকত—কখনও তত্ত্বগত প্রবন্ধ (theoritical) কখনও বা ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ। বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত 'ইনটারন্যাশনাল প্রেস করেসপনডেন্স'-এ ফরাসী বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে আমি প্রতি সপ্তাহেই লিখতাম। আন্তর্জাতিক পত্রিকা 'ক্লার্তে' এবং দূরপ্রাচ্যবিষয়ক পত্রিকা "সীন"-এর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল আমার। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশের ঘটনাবলী, বিশেষ ক'রে চীনের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে ফরাসী জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছিলাম। আমার এই প্রচেষ্টার জন্য চীন সরকার আমাকে 'নাইট অব দি অর্ডার অব জেড' এই সম্মানসূচক উপাধি দান করেন। উপনিবেশিক মন্ত্রী জর্জ ম্যাণ্ডেলও এই সম্মান লাভ করেছিলেন।

১৯২৮-২৯ এই দুই বছর মস্কো থেকে প্রকাশিত "প্রাভদা"র সংবাদদাতা ছিলাম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকা থেকে

প্রকাশিত "নিউ ম্যাসেস"-এ (এখন—"ম্যাসেস অ্যাণ্ড মেইনষ্ট্রীম" অঃ) লিখেছি।

'এদিশিওঁ সোস্যালিষ্টে ইনতারন্যাশিওনাল' (Editions Socialistes Internationales)-র আনুকূল্যে আমার কিছু কিছু রিপোর্টাজ একটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকা প্রকাশের ফলে আবার সেই ১৮৯৪-এর প্রেস আইন ভঙ্গের অপরাধে অভিযুক্ত হলাম। পল ভেইলঁ্যা কুতুরিয়ে এবং আমি ১৯২৯ সনে আবার এক বছরের জন্য 'লা সাঁতে' কারাগারে অবরুদ্ধ হই। ১৯২৮ সনে আইন পরিষদের সদস্য পদের জন্য ভার জেলা থেকে পিয়ের রেনোদেল-এর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি। ১৯৩২ সনে আরজেনট্যুল জেলা কম্যুনিষ্ট পার্টি আমাকে মনোনীত করে—রেভু ছ্য' প্যারি (Revue de Paris)র আন্দ্রে ছ্য' ফেজের বিরুদ্ধে আমিই নির্বাচনে সাফল্য লাভ করি।

'ল্যুমানিতে'র কাজও সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। সুদীর্ঘ সাত বছর ধরে আমার দিনগুলো ভাগ করা ছিল আইন পরিষদ ও 'ল্যুমানিত'র কাজে। সন্ধ্যা কাটতো আমার নির্বাচন-ক্ষেত্রায়। মধ্য রাত্রিত 'ল্যুমানিতে'র অফিসে ফিরেই কাজে বসতাম; বিলম্বে প্রাপ্ত খবরাখবরগুলো একটু দেখেশুনে দিতে হবে। বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত ভোর হয়ে যেত। প্যারিসের জনবিরল পথে তখন মহা কলরবে দুধের গাড়ীগুলো চলতে সুরু করেছে।

১৯৩২ সনে আইন পরিষদে কম্যুনিষ্ট সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র দশ জন। সুতরাং আমাদের প্রত্যেককেই বেশ কয়েকটি বিষয়ে মাথা ঘামতে হ'ত। বৈদেশিক নীতি ছাড়াও আমি শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে যাবতীয় তথ্য অনুসন্ধানে লেগে পড়লাম। আইন পরিষদের অধিবেশনের সুরুতেই আমি 'এডুকেশন কমিশনে' নির্বাচিত হই। স্বনামখ্যাত অধ্যাপক কাজালস এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন। মাধ্যমিক শিক্ষায় সম্ভাব্য পরিবর্তন ও প্যারিসের সরকারী লাইসেতে (lycees) শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পিতামাতার সঙ্গে সংযোগ করা, এই দুটি বিষয় আমার উপর ন্যস্ত হয়। ১৯৩৪ সনে সাধারণ সমস্যাগুলির উপর কমিশনের সামনে এক বক্তৃতা দিই। আইন পরিষদের অধ্যাপক সদস্যরা "ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংকট" শিরোনামা দিয়ে আমার বক্তৃতাটি মুদ্রিত করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সমিতির মুখপত্রে আমার বক্তৃতা থেকে সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি বের হয়।

'তরুনের অপরাধ প্রবণতা' (Juvenile delinquency) সমস্যটি সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি ছিল আমার। বেল দ্বীপ ও এ্যানিয়েন-এর সংশোধনাগার থেকে প্রায়ই অপরাধী পালাবার খবর আসতো। এই সমস্ত সংশোধনাগারের কার্যক্রম ও পরিচালনা সম্বন্ধে আমি ফরাসী সরকারকে জানিয়ে দিই এবং সঙ্গে আমার কয়েকটি প্রস্তাবও জানাই। ১৯৩৬ সনে ঐ

প্রস্তাব কার্যকরী হয়—সংশোধনাগারের পরিবর্তন সম্বন্ধে এক আইনও পাশ হয়।

সুদীর্ঘ সাত বছর ধরে আইন পরিষদে বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত যাবতীয় তর্কবিতর্কে অংশ গ্রহণ করেছি। ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য-জীবনের শুরুতেই বুঝতে পেরেছিলাম ফ্রান্সের একটু কঠোর নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন, নইলে ক্ষয়িষ্ণু জাতীয়তাবাদের তরী কোনমতেই রক্ষা পাবে না। এই কঠোর মনোভাব নিয়েই ১৯৩২ সনে বিতর্কসভায় আমি আমেরিকাকে দেয় যুদ্ধঋণ ও ক্ষতিপূরণ বাতিল করতে চেয়েছিলাম। যুদ্ধঋণের জন্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে, এক স্যু (sou)ও দেব না এক ফেনিংও (pfenning) নেব না এই ছিল আমার যুক্তি। আমরা আমেরিকার খাতকও নই জার্মানীর মহাজনও নই।

এই সব ঘটনার পর নাৎসীবাদের অভ্যুদয়ে যে আমার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হবে এতো নিতান্তই স্বাভাবিক, সহজবোধ্য। এখন ভার্সাইএর খণ্ডীকৃত ইউরোপ এবং উন্নততর ইউরোপের সমস্যা নয়, এখন সমস্যা সম্পূর্ণ নতুন ধরণের—এখন হয় শান্তি নয়তো ক্লেমাসোর ভার্সাই-র স্থলে হিটলারের ভার্সাই-র সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ করবার জন্য যুদ্ধ প্রস্তুতি। আমি শান্তির পথই বেছে নিয়েছিলাম। সাত বছর ধরে 'ল্যুমানিতে'র স্তম্ভে স্তম্ভে, আইন পরিষদের বিতর্ক সভায় শান্তির অনির্বান বাণী ঘোষণা ক'রে এসেছি,—অনলস শান্তি-নীতি সমর্থন করেছি—

শান্তি রক্ষা করতে হলে, শান্তিকে বাঁচাতে হলে, সমস্ত শান্তিকামী মানুষের সহযোগিতায় শান্তির এক লৌহদৃঢ় দুর্গ গড়ে তুলতে হবে পারস্পরিক সহযোগিতায় শান্তি হয়ে উঠবে দুর্মর দুর্ভেদ্য,-সর্বকলাণময় হবে তার রূপ। আক্রমণকারী যে কোন শক্তিই এ লৌহ কঠিন দেয়ালে আঘাত খেয়ে ফিরে যাবে। যৌথ নিরাপত্তার সম্ভাবনা দেখা দেবে এই শান্তি অভিযানে। বাক-বিতণ্ডার অবসান হ'য়ে শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ সুগম ক'রে দেবে।

আমার সম্বন্ধে জনমত প্রচলিত ছিল যে আমি ভাবজগতে এক জেহাদ (ideological crusade) ঘোষণা করেছি। সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এই ধারণা। আমি বরং ভেবেছি বিভিন্ন দেশের সঙ্গে (তাদের আভ্যন্তরিণ শাসন ব্যবস্থা যাই হোক না কেন) ফ্রান্সের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ রক্ষা করতে হবে এবং সেই সঙ্গে ফ্রান্সকে এ কথাও ভুললে চলবে না যে তার নিজস্ব কাজও আছে—সে কাজ স্বাধীনতার, প্রগতির। এ দিয়েই তো জগৎ সমক্ষে ফ্রান্সের বিচার হবে আর তার কার্যক্রম সম্বন্ধে কোন সন্দেহ, কোন নিরাশা দেখা দিলেই তো ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হয়ে উঠবে। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য' আর সেইজন্যই না কঠোর নীতি অনুসরণ করতে হলে ফ্রান্সকেও হ'তে হবে বীর্য্যবান. শক্তিসম্পন্ন।

তাছাড়া শক্তি বলতে আমি বিশ্বাস করি যে শক্তির উৎস

দেশের জনগনের হৃদয়বৃত্তিতে। তারা বিশেষ ক্ষমতার প্রতিভূ নয় বরং তাদের লক্ষ্য আত্মনিয়ন্ত্রণ, সামাজিক সুযোগ, স্বাধীনতা রক্ষা—এই দায়িত্ববোধই তো তাদের শক্তির উৎস।

১৯৩৪ সনে আমি আইন পরিষদের বৈদেশিক নীতি কমিশনের সভ্য হই। তখন থেকেই আমার বক্তৃতাবলীর মধ্যে যে ভাবধারা প্রকাশ পেয়েছে তার একটু চুম্বক বিবৃত করলাম মাত্র। আমার মনোমত এই ভাবধারা অক্ষুন্ন রাখতে গিয়ে আমাকে প্রায় প্রতিটি বৈদেশিক মন্ত্রীর বিরোধিতা করতে হয়েছে। এ কথা বলাই বাহুল্য যে আমি অত্যন্ত স্পষ্ট ও নির্ভীকভাবেই তাদের সমালোচনা করেছি এবং আমার অন্তরের দৃঢ়মূল বিশ্বাসই আমার এই সমালোচনার কারণ।

১৯৩৫ সনে লাভালের ইতালী-নীতির বিরোধিতা করি। আদর্শগত পার্থক্যের কথা বাদ দিলেও ফ্রান্সের পক্ষে ইতালীর ভূমধ্যসাগরীয় সাম্রাজ্যবাদের নীতি সমর্থন করা আমার কাছে অত্যন্ত বিপজ্জনক মনে হয়েছিল এবং আমার মতে এ-নীতি অনুসরণ করলে জাতিসংঘের ভাঙ্গনও শিগ্‌গিরই দেখা দিত।

আইন পরিষদে আমার বক্তৃতাবলীর ফলে মন্ত্রীসভা পতনের সম্ভাবনা দেখা দিল—১৯৩৬ সনে সত্য সত্যই সরট (Sarraut) মন্ত্রীসভার পতন হয়। নতুন মন্ত্রীসভা গঠনের সময় কম্যুনিষ্ট সদস্যদের তরফ থেকে আমি জানিয়ে দিলাম যে সরকারের বৈদেশিক নীতি পরিবর্তিত না হ'লে আমাদের পক্ষে

সহযোগিতা করা কোনমতেই সম্ভব নয়। লাভাল মন্ত্রীসভার ফরাসী-রুশ মৈত্রী সম্বন্ধে টালবাহানার ব্যাপারটি আমি ও আনাতোল দ্য মনজি তীব্রভাবে সমালোচনা করি। পরে ফরাসী সরকার রুশফরাসী পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাহায্যের নীতি অনুমোদনের জন্য চেম্বারের উপর চাপ দেয় —আমি সরকারের মনোভাবে অকুণ্ঠচিত্তে স্বাগত জানিয়েছিলাম —পিয়ের আঁতিয়ে ফ্ল্াঁদিন এবং এডুয়ার্ড এরিয়ো—এরাও এই মতের পোষক ছিলেন।

গতবারের চেয়ে অনেক বেশী ভোট পেয়ে ১৯৩৬ সনে আর্জেনট্যুলের ডেপুটি পদে আবার নির্বাচিত হলাম। বৈদেশিক কার্য্যসংক্রান্ত কমিশনের (Foreign Affairs Commission) নতুন কার্যারম্ভের সূচনাতেই সহ-সভাপতি পদের জন্য প্রার্থী হই এবং নির্বাচিতও হয়ে গেলাম সহজে। আমার সহকর্মীরা অনুরোধ জানালেন আমি যেন ঐ পদে ১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বর অবধি কাজ করি এবং সেই অনুসারে তাঁরা ভোট দিয়েছিলেন। ১৯৩৭ সনে আমি বিমান চালনা কমিশন (Aviation Commission)-এ আসি, আমার আগে পল ভেইল্যাঁ কুতুরিয়ে ছিলেন। অন্যান্য কাজ থাকলেও আমার সমস্ত আকর্ষণ ছিল "বৈদেশিক কার্যসংক্রান্ত কমিশনে।"

লাভালের সঙ্গে যে সব বিষয় নিয়ে মতবিরোধ ছিল, বিরোধিতা করেছি তার, ঠিক একই কারণে লাভালের

অনুগামীদের সঙ্গে অনৈক্য দেখা দিল। ইভস ডেলবোস, জর্জ বোনে-র বিরোধিতা করেছি প্রচুর কিন্তু কোন কারণেই মতবিরোধের শোভন গণ্ডী অতিক্রম ক'রে যাইনি।

স্পেন ও স্পেনের নিরপেক্ষ নীতির বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদের কণ্ঠ কঠিন হ'য়ে ওঠে। ১৯৩৬ সনের জুলাই মাসে, ১৯৩৯-এর জানুয়ারী মাসে স্পেন সম্বন্ধে যে সব বক্তৃতা দিই তাতে আমার আদর্শগত মতামত স্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। তা সত্বেও আমি ফ্রান্সের জাতীয়স্বার্থ ও নিরাপত্তা সম্বন্ধে আগ্রহশীল ছিলাম বেশী। ফ্রান্সের চিন্তাই সর্বক্ষণ ঘিরে থাকতো আমাকে।

আমার জার্মান নাৎসীবাদের বিরোধিতাকে যদি কেউ জার্মানীর বিরুদ্ধেই বিরোধিতা বলে প্রচার করেন তবে তার চাইতে ঘোরতর অন্যায় এবং ইতিহাসের বিকৃতি আর কিছুই হতে পারে না। আইন সভার ভিতরে এবং বাইরে একটি কথাই আমি বার বার বলেছি—আমি শান্তি প্রয়াসী, আমি শান্তি চাই, সমস্ত দেশের সঙ্গে শান্তি চাই। বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীন শাসন-ব্যবস্থা বিভিন্ন হতে পারে কিন্তু শান্তির পরি বেশটি একান্ত প্রয়োজন। তবে শাসন-ব্যবস্থার বিভিন্নতা স্বীকার ক'রে নিলেও সমানাধিকারের ভিত্তিতেই শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সমানাধিকারের ভিত্তি ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার ফরাসী-জার্মানী সমঝোতা আমার কাছে বিপ্লবের

পরিপন্থী এবং মার্কসবাদ বিরোধী ব'লে মনে হয়েছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষেও অত্যন্ত ক্ষতিকর এই সমঝোতা। ইতিহাসের নজির "সাদোয়ার পর সেদান"[৪]—এরই অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে হয়েছিল পূর্ব ইউরোপের ভাগ্য সাম্রাজ্যবাদী অভিযানকারীদের হাতে তুলে দিয়ে পশ্চিম ইউরোপের শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা নিতান্তই বিপজ্জনক হবে।

১৯৩৮ সনের জুন মাসে নাৎসী জার্মানী সরকারীভাবে অষ্ট্রিয়া দখল করবার পর আমি যে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলাম তাতে এই মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে এবং অনুরূপ মনোভাব নিয়েই ম্যুনিক চুক্তি ও তার স্বাক্ষরকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান ঘোষণা করেছি।

১৯৩৯ সনের মার্চ মাসে শান্তির অন্তিম প্রহর বোধ হয় সমাসন্ন। এই ঘোর দুর্দিনেও আমি বিশ্বাস হারাইনি যে রাজনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে যুদ্ধ নিশ্চিতই বন্ধ করা সম্ভব। ফ্রান্স, বৃটেন এবং সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে ত্রিদলীয় রাজনৈতিক ও সামরিক চুক্তির সম্ভাব্যতা সম্পর্কে আমি ফরাসী সরকারকে অবহিত করি। কথাবার্তা শুরু হলেও গভর্ণমেণ্টের মৌনভাব এবং মৌননীতি লক্ষ্য ক'রে ১৯৩৯ সনের মে মাসে আইনসভায় তার সুতীব্র সমালোচনা

---

(৪) ১৮৬৬ ও ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে রুশিয়ার যুদ্ধ।

করেছিলাম। ঐ বছরই জুলাই মাসের শেষদিকে কয়েকটি গুপ্তচরবৃত্তি প্রকাশ হয়ে পড়ে। লামুরেলকে গ্রেপ্তার করা হয়। 'ল্যুমানিতে'র সম্পাদক লুসিয়ে সাঁপে ফ্রান্সে নাৎসী প্রোপাগাণ্ডার এবং কি'ডর্সে (Quai d'orsay)র অটো আবেৎস [৫] (Otto Abetz) ও তার সাকরেদদের কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করেন 'ল্যুমানিতে'র স্তম্ভে স্তম্ভে। 'ল্যুমানিতে'র বিরুদ্ধে অভিযোগ এলো, সাঁপেইকে দাঁড়াতে হোলো কাঠ-গড়ায়। মেতর দ্য মরোগিয়াফেরি সহায়তায় আমি সাঁপেইর স্বপক্ষে এবং অনুকুলে অনেক কথা বলেছিলাম এবং এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ফ্রান্সে নাৎসী প্রচারকার্যের কঠোর সমালোচনা করি।

অব্যবহিত পরেই ফরাসী আইন পরিষদের এক প্রতিনিধি-দলভুক্ত হয়ে লণ্ডন যাই। ইভেস ডেলবো, পল বাস্তিদ, পিয়ের তেত্তিঙ্গের আমার সহযাত্রী ছিলেন। সাধারণ ভাবে মতামত বিনিময়ের উদ্দেশ্যে 'হাউস অব কমন্স'-এর বহু সদস্য আমাদের আমন্ত্রন জানিয়েছিলেন। আমরা যাদের সঙ্গে আলাপ করেছি তারা প্রায় সকলেই একমত ছিলেন যে আগামী ইঙ্গ-রুশ-ফরাসী চুক্তি ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হবে। লয়েড জর্জ তো স্পষ্টই

(৫) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পূর্বে এ লোকটি ছিল ফ্রান্সে নাৎসী প্রচারের প্রধান কর্মকর্তা। ১৯৪০-এ জুন মাসে ফরাসী বিপর্যয়ের পরে ফ্রান্সের মার্শাল পেতাঁর সরকারের সময়ে এ লোকটি নিযুক্ত হয় নাৎসী রাজপ্রতিনিধি।

বললেন : "চেম্বারলেন, দালাদিয়ের, কর্ণেল বেকের হাতে ইউরোপের ভাগ্য নিয়ন্ত্রনের ভার থাকলে রুশিয়ার সঙ্গে কোন প্রকার সন্ধি হবে না—যুদ্ধ হতেই হবে—যুদ্ধ সুনিশ্চিত, অবশ্যম্ভাবী"।

১৯৩৯ সনের আগষ্ট মাসে যখন যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠলো বার বার স্মরণ করেছি লয়েড জর্জের সেই উক্তি। জার্মান সোভিয়েট অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার দুদিন পরে আমি 'ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিশনের' এক অধিবেশনে উপস্থিত হই। এই শেষ অধিবেশনে যোগদান, কারণ সরকার সমস্ত পার্লিয়ামেণ্টারী কমিটি থেকে কম্যুনিষ্ট বিতাড়নের নীতি গ্রহণ ক'রে ফেললো।

অবশ্য সেই অধিবেশনে আমি আমার বক্তব্য যথাযথভাবেই পেশ করেছিলাম যে আমি মনে করি ত্রিদলীয় চুক্তি ব্যর্থ হবার পিছনে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের দায়িত্ব অত্যন্ত বেশী এবং বিভিন্ন পক্ষের আলাপ আলোচনা লিপিবদ্ধ ক'রে একটি সরকারী পুস্তিকা (White Book) অবিলম্বেই প্রকাশ করা কর্তব্য। তাছাড়া রুশ জার্মান চুক্তি সম্বন্ধেও স্থিরভাবে চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তা আছে। সেন্টিমেণ্ট কিংবা আবেগের অবকাশ না রেখে এই চুক্তিটিকে বিচার করতে হবে। বরং এই চুক্তিকে, শান্তি স্থাপনের প্রথম সোপান হিসেবে গ্রহণ করা এবং কাজে পরিণত করাই বোধ হয় সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত কাজ। ম্যুনিক

(Munich) চুক্তির ব্যর্থতা ভরে দেবে এই নতুন চুক্তি—প্রশস্ত ক'রে দেবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পথ।

এ ধরনের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয় কিনা তার সাক্ষ্য দেবে ইতিহাস। কিন্তু এই প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে যুদ্ধের ডাংগুলি খেলায় ফ্রান্সের অবশ্যম্ভাবী পরাজয় প্রত্যক্ষ করেছিলাম। তাই ওয়ার্কার অ্যাণ্ড পেজাণ্ট গ্রুপের মতে সায় দিয়েছিলাম এবং আইন পরিষদের প্রেসিডেণ্ট এডুয়ার্ড এরিয়ো (Edouard Herriot) -কে যে চিঠি পাঠান হয় তাতে আমি স্বাক্ষর দিই।

১৯২২ সনে ড্রাফট বোর্ড (Draft Board) আমাকে 'পরবর্তী কালে বিবেচনা করা হবে' ব'লে বাতিল ক'রে দেয়। ("পরবত কালে বিবেচিত হবে" আখ্যাপ্রাপ্তরা কোনদিনই সেনাবাহিনীতে সুযোগ পায় না)। তা সত্বেও ১৯৩৯ সনে যুদ্ধ বাধবার সঙ্গে সঙ্গে আমি আবার ড্রাফট্ বোর্ডের অনুমোদন প্রার্থনা করি যে 'আমিও আমার দেশের কাজে লাগতে :পারি"। অনুমোদন মেলে— আমি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানালাম আমাকে যেন তাড়াতাড়ি নেওয়া হয়। ১৯৩৯ সনের অক্টোবর মাসে ডাক এলো কিন্তু তখন জাজ ভ্রি মজাক-এর কৃপায় আমার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ঝুলছে। বাড়ী ছাড়লাম—মিলিটারী সমন আমার হদিশ না পেয়ে আমাকে পলাতক (Draft evader) বলে দোষী করলো। সমন হাতে পড়লেই হয়েছিল আর কি—তখন আর সৈন্য ব্যারাক নয় সোজা ঠাণ্ডাগারদে যেতে হত।

আর কিছু নেই জানাবার-—বাকী সবই তো সকলের জানা। মোটামুটি সব কথাই বলেছি। আমি বিবাহিত। ১৯৪০ সনের ২৫শে মে থেকে আমার স্ত্রী কোন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে আছেন। আমার নামের সঙ্গে সংযোগ থাকাটাও যে প্রচণ্ড অপরাধ! নিজের কোন সন্তান নেই— ছোট্ট একটি ভাইঝি আছে—ওকেই সন্তান স্নেহে লালন করেছি। ওর বাবা স্পেনের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা ছিলেন—স্পেনের যুদ্ধে নিহত হন। ভাইঝিকে বলেছিলাম ওর বাবার অভাব পূরণ করব—কিন্তু আজ আর ভরসা পাচ্ছি না সে-প্রতিশ্রুতি রাখতে পারব বলে।

এই শেষ। সময়ের সুদীর্ঘতা ও প্রাচীনতা আমাকে হত-বিশ্বাস করেনি। কম্যুনিজমের ভাবধারা থেকে এতটুকু বিচ্যুত হইনি আমি। তার কারণ হয়ত এই যে কম্যুনিজমের নিছক ফর্মুলা নিয়ে আমি কোনদিনই মাথা ঘামাইনি। তার ভাব রসধারাই সমস্ত জীবন দিয়ে, আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করেছিলাম; আর তাই না আমার জীবন অপরিস্ফুট, ভ্রূণকল্প অস্তিত্বের সম্ভাবনা থেকে রক্ষা পেয়েছে। নইলে এক উদ্দেশ্যলক্ষ্যহীন শূন্যগর্ভ জীবনই যাপন করতে হ'ত। যে বিশ্বাস নিয়ে, যে মতবাদে আস্থা রেখে জীবন আরম্ভ করেছিলাম তা থেকে এত-টুকু পথভ্রষ্ট, লক্ষ্যচ্যুত হইনি এবং আজও সেই মতবাদে আস্থাশীল, [illegible]স

এই বিশ্বাস, এই আস্থাই কি জীবনকে আলোকসমৃদ্ধ ক'রে তুলবে না? সুখের সন্ধান না দিলেও বাঁচার প্রত্যয়ে ভরে দিতে পারবে না জীবন?

গ্যাব্রিয়েল পেরির রাজনৈতিক জবানবন্দী হিসেবে এই পুস্তিকার মূল্য অপরিসীম। প্যারিস অবরোধকারী জার্মানদের হাতে ১৯৪১ সনের ১৫ই ডিসেম্বর বন্দী অবস্থায় হত্যা করা হয় তাঁকে। হত্যার কয়েকদিন আগে এই আত্মচরিত জেলখানা থেকে লুকিয়ে বাইরে আনা হয়, পরে ফরাসী গোপন ছাপাখানা প্রকাশ করে এই আত্মচরিত। ......

১৯৪১ সন, ১৫ই ডিসেম্বর। উষার আলো প্রকাশ হচ্ছে ধীরে ধীরে। অনন্ত রাত্রির অন্ধকার নামছে পেরির জীবনে—ঘাতকদলের সন্মুখীন হতে চলেছেন পেরি। সৈন্যেরদল, ঘাতকের দল তীক্ষ্নলক্ষ্যে বন্দুক উচিয়ে ধরেছে। স্থিরলক্ষ্য পেরি ধরেছেন গান—'লা-মার্সাই'র প্রদীপ্ত স্বরভঙ্গিমায় আবেগময় হয়ে উঠেছে আকাশ। প্রথম ঝাঁকগুলি গিয়ে লাগলো পায়ে—জীবনের সমস্ত আবেগ উম্মুখর হয়ে উঠলো ওষ্ঠভঙ্গিতে। এতক্ষণ তিনি গাইছিলেন ফ্রান্সের জন্য, এখন গাইলেন বিশ্ব মানবতার উদ্দেশ্যে— ইন্টারন্যাশনালের দুর্মর, দুর্জ্জয় সঙ্গীত। দ্বিতীয় ঝাঁকগুলি গিয়ে লাগলো; রুদ্ধ হ'লো সঙ্গীত; বাঙ্ময় কণ্ঠ চিরতরের জন্য বাণীহীন হয়ে গেল জার্মান জল্লাদের গুলিতে। পেরির কথা ফুরোলো কিন্তু ফুরোলো না তার অমর কাহিনী। জীবন বিসর্জন দিয়ে দেশাত্মবোধের, দেশপ্রেমের, মানবমর্য্যাদার অনির্বান অক্ষয় প্রমাণ রেখে গেলেন মৃত্যুঞ্জয় পেরি। তার শেষ চিঠিই থেবে তার স্বাক্ষর।